রিজার্ভের পরিমাণ সন্তোষজনক, চলবে সাড়ে চার মাসের বেশি

করোনাভাইরাস মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যে ধাক্কা দেশের রিজার্ভে লেগেছিল, সরকারের নানামুখী পদক্ষেপে তা অনেকটাই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতেই আমদানিকে নিরূৎসাহিত করা হয়েছিল, যার সুফলও মিলতে শুরু করেছে।

গত বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলো নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৯ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক ০৬ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, বর্তমানে যে রিজার্ভ আছে তাতে উদ্বেগের কিছু নেই। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষ সময়ে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে বৈদশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র তিন দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারের নানামুখি পদক্ষেপের কারণে এরইমধ্যে রিজার্ভের উন্নতি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রথমে কোভিড মহামারী এবং তার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্বের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেক দেশই পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। সে তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালোভাবেই সচল রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নানামুখি পদক্ষেপের কারণে দেশের কৃষি অর্থনীতিও অনেক ভালো অবস্থায় আছে। যদিও ডলার সংকট মোকাবেলায় সরকার আমদানি নির্ভরতা কমাতে জোর দিয়েছে। এতে পরিস্থিতি দারুণভাবে সামাল দেওয়া যাচ্ছে।

বৈদশিক মুদ্রার রিজার্ভ সম্পর্ক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক এসব তথ্য জানিয়ে বলেন, “রিজার্ভ কমছে বলে যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে সেটি সঠিক নয়। ২০০৬ সালের

তুলনায় বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ সন্তোষজনক। এখন যে পরিমাণ রিজার্ভ আছে তাতে সাড়ে চার মাসের বেশি চলবে।”

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিভিন্ন পণ্য আমদানির জন্য ৪৩৭ কোটি ২৪ লাখ (৪.৩৭ বিলিয়ন) ডলারের ঋণপত্র বা এলসি খুলেছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। যদিও এই অঙ্ক গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩১ দশমিক ১৯ শতাংশ কম।

২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই মাসে ৬৩৫ কোটি ৪০ লাখ (৬.৩৫ বিলিয়ন) ডলারের এলসি খোলা হয়েছিল। অন্যদিকে এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ২০ দশমিক ১৪ শতাংশ। গত জুলাইয়ে ৭৪৯ কোটি ১৮ লাখ (৭.৪৯ বিলিয়ন) ডলারের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে ৫৯৮ কোটি ৩০ লাখ (৫.৯৮ বিলিয়ন) ডলারের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছিল।

যদিও ডলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির লাগাম টেনে ধরতে নানা পদক্ষেপ নেয়। এ কারণে গত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের শুরুতে এলসি খোলার পরিমাণ কিছুটা কমেছে। তবে এটা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের পুরো সময়ে (২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জুন) বিভিন্ন পণ্য আমদানির জন্য সবমিলিয়ে সাত হাজার ২১৯ কোটি ৮০ লাখ (৭২.২০ বিলিয়ন) ডলারের এলসি খুলেছিলেন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। যা ছিল আগের অর্থবছরের (২০২১-২২) চেয়ে প্রায় ২৬ শতাংশ কম।

গত ১২ জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কথামতো রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই দিন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘গ্রস’ হিসাবের পাশাপাশি বিপিএম৬ পদ্ধতি অনুসরণ করেও রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন অর্থনীতিবিদরা।

ওই দিন (১২ জুলাই) ‘গ্রস’ রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৯ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার।

অবশ্য গত দেড় মাসে ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভ কমেছে ৬৫ কোটি ডলার। আর বিপিএম৬ পদ্ধতির হিসাবে কমেছে ৪১ কোটি ডলার।

আমদানি কমায় এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স ও রপ্তানি আয় বাড়ায় ২০২১ সালের আগস্টে এই রিজার্ভ বাড়তে বাড়তে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলারের গ্রস রিজার্ভ (তখন বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাব করা হত না) মাইলফলক অতিক্রম করেছিল।

এরপর আমদানি বাড়ায় এবং রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স কিছুটা কম যাওয়ায় হোঁচট খাওয়ায় রিজার্ভও কিছুটা কমতে থাকে। এ কারণে অর্থনীতিতে কিছুটা চাপ বাড়তে থাকে। এ কারণে গত বছরের এপ্রিল থেকে আমদানি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে আমদানি খরচ বেশ কমে এসেছে।

অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) জুলাই-আগস্ট মেয়াদের আমদানি বিল পরিশোধ করতে হবে। তখন রিজার্ভ আরেকটু কমে আসবে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের আমদানি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়, জুলাই মাসে খাদ্য (চাল ও গম) আমদানির এলসি কমেছে ২১ দশমিক শূন্য এক শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল মেশিনারি (মূলধনি যন্ত্রপাতি) আমদানির এলসি কমেছে সবচেয়ে ২২ দশমিক ১৭ শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ১ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

শিল্পের মধ্যবর্তী পণ্য (ইন্টারমেডিয়েট গুডস) আমদানির এলসি কমেছে ৩০ দশমিক ৬৫ শতাংশ; নিস্পত্তি কমেছে ১৭ শতাংশ। জ্বালানি তেলের এলসি কমেছে ৫০ দশমিক ১২ শতাংশ; নিষ্পত্তি বেড়েছে ৩৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

শিল্পের কাঁচামাল আমদানির এলসি কমেছে ৩৬ দশমিক ১২ শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ২৪ দশমিক ৩১ শতাংশ।

এছাড়া নতুন অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে অন্যান্য পণ্য আমদানির এলসি কমেছে ১৮ দশমিক ৬২ শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ১১ দশমিক ২১ শতাংশ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য আমদানিতে মোট ৬৯ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার

ব্যয় করেছে বাংলাদেশ। যা ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ কম।

দেড় বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও ডলারের সংকট দেখা দিয়েছে। গত বছরের মার্চে দেশে মার্কিন ডলারের যে সংকট শুরু হয়েছিল, তা এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠা যায়নি। তেমনি রিজার্ভ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে ডলার বিক্রিও বন্ধ হয়ে যায়নি। এটা নিয়মিত চলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় আমদানি অব্যাহত রাখতে দুই বছরের বেশি সময় ধরে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে চলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করা হয়েছে এক হাজার ১৪৭ মিলিয়ন। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করেছে ১৩ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন।

২০২১-২২ অর্থবছরে ৭ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছিল। আর চলতি অর্থবছরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত (প্রায় দুই মাস) বিক্রি করা হয়েছে দেড় বিলিয়ন ডলারের মত। তবে সব ব্যাংকের কাছে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে না বাংলাদেশ ব্যাংক। শুধু সরকারের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করা হচ্ছে।

বৈদশিক মুদ্রার রিজার্ভসহ সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, “ডলার কেনাবেচা হচ্ছে। তবে সবাই যে ডলার বিক্রি করবে তাতো নাও হতে পারে। কারণ অনেকের কাছে ডলার নাও থাকতে পারে। যার কাছে নেই সে কেনাবেচা করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। যাদের কাছে আছে তারাই বিক্রি করবেন।”

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ

দেখিয়ে ফের দাম বাড়ল সয়াবিনের

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে তা লিটারে ৯ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে-যা মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর করা হয়।বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেলের দাম নিম্নমুখী। এরপরও দেশে বাড়ানো হলো এর দাম।

পরিশোধন মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি জানিয়েছে।

এদিকে তেলের দাম বাড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, বাজারে সব ধরনের পণ্যের উচ্চমূল্যের মধ্যেই তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

মিল মালিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি হবে ১৭৫ টাকায়, যা এর আগে ১৬৬ টাকা ছিল। অর্থাৎ, খোলা সয়াবিনের দাম লিটারে বাড়ছে ৯ টাকা। আর প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৯২ টাকায়, যা এতদিন ১৮৫ টাকা ছিল। অর্থাৎ লিটার বোতলে ক্রেতাকে ৭ টাকা করে বাড়তি গুনতে হবে। সয়াবিন তেলের ৫ লিটারের বোতল বিক্রি হবে ৯৪৫ টাকায়। সেক্ষেত্রে লিটার প্রতি দাম পড়বে ১৮৯ টাকা।

নতুন সিদ্ধান্তে সয়াবিনের দাম বাড়লেও লিটারে ৭ টাকা কমেছে পাম তেলের দাম। প্রতি লিটার পাম তেল এখন বিক্রি হবে ১৪৫ টাকায়, যা আগে ১৫২ টাকা নির্ধারিত ছিল।

এদিকে বিশ্ববাজার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জুনে প্রতি টন সয়াবিন তেলের মূল্য ছিল ১৭৫১ ডলার। মঙ্গলবার তা ছিল ১৫১৬ ডলার। অর্থাৎ এ সময়ে প্রতি টনে দাম কমেছে ২৩৫ ডলারেরও বেশি।

সমিতির সচিব নুরুল ইসলাম মোল্লা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা কমলেও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে। সে কারণে আমরা লিটারে দাম ২০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলাম।

মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সমিতির চিঠিতে বলা হয়, ৩ আগস্ট

সয়াবিন তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী ১৭ আগস্ট আলোচনার পর মূল্যবৃদ্ধির এ ঘোষণা দেওয়া হলো। ২৩ আগস্ট থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে।

রাজধানীর নয়াবাজার ও কেরানীগঞ্জের জিনজিরা কাঁচাবাজার ঘুরে এবং বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, খুচরা বাজারে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৮২ টাকায়, যা ১৭৫ টাকা নির্ধারিত দামের তুলনায় ৭ টাকা বেশি। পাশাপাশি প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৯২ টাকা। আর পাম তেলের দাম কমানো হলেও আগের দরে প্রতি লিটার ১৫০-১৫২ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা ১৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারে তেল কিনতে আসা মো. ইসমাইল বলেন, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা হলেই তেলের দাম বাড়ায়। কিন্তু গণমাধ্যমেই খবর শুনছি বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে। তাহলে আমাদের দেশে কীভাবে তেলের দাম বাড়ে। সরকার আমাদের কথা একটুও মাথায় রাখে না। বাজারে একের পর এক পণ্যের দাম বাড়ছে। আমাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারের মুদি বিক্রেতা সাক্কুর আলম বলেন, বাজারে নতুন দামে বোতলজাত সয়াবিন সরবরাহ নেই। দু-একদিন সময় লাগবে সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে। তবে অনেক অসাধু বিক্রেতা আগের বোতলজাত সয়াবিন নতুন দামে বিক্রি করছে, যা কাম্য নয়।

জানতে চাইলে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, পরিবহণ ভাড়া বৃদ্ধির অজুহাতে অনেক পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবেও বাড়ছে। সেই দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে না আনতেই সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হলো। এতে ক্রেতাদের ব্যয় আরও বাড়বে। তাই সংশ্লিষ্টদের উচিত তেলসহ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নেওয়া। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। পরিবহণ খরচ বাড়ায় পণ্যের দাম কত হয়, তা নির্ধারণ করা। এতে অসাধুরা সুযোগ নিতে পারবে না।